নরম হিন্দুত্ববাদকে প্রশ্রয় দেওয়ার মূর্খতা

নিখিল মেনন

৫ জুলাই, ২০২২

ভারতে হিন্দু জাতীয়তাবাদের দ্রুত উত্থান ঘটছে; এর তুমুল শৃঙ্খলার সঙ্গে মেলবন্ধন হয়েছে এমন এক আত্মসন্তুষ্টির যা আসে কোনরকম শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়ার নিশ্চয়তা থেকে। আঞ্চলিক ও জাতীয় – দুই ক্ষেত্রেই এর জয় হয়েছে, দেশের নাগরিকদের মধ্যে যার প্রতিধ্বনি উঠেছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এবং অযোধ্যায় মসজিদ ভেঙে সেখানে মন্দির নির্মাণের হাত ধরেই এই নতুন সন্ধিক্ষণের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকে এবং সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত অন্যান্য অসংখ্য উপসর্গের মধ্যে দিয়ে সারা দেশ জুড়ে এই রাজনৈতিক মতাদর্শের বিস্তারের রহস্য প্রকাশিত হচ্ছে। কর্ণাটকের সরকারী কলেজে হিজাবের উপর সাম্প্রতিক নিষেধাজ্ঞা বা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতে বুলডোজার রাজনীতি বা বিশেষ উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি বা অন্যান্য নির্মাণ ভাঙার জন্য বুলডোজার ব্যবহারের রাজনীতি হল এমন একটি রাজনৈতিক অবস্থানের সাম্প্রতিকতম পর্ব যা ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের ভিত্তিতে ক্ষয় ধরাচ্ছে। অন্ধের মত এগিয়ে চলা হিন্দুত্বের এই বিপুল, বিকট মূর্তিকে কিভাবে থামান যায় সে নিয়ে বিরোধী দলগুলি সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে।

নির্বাচনী ক্ষেত্রে দৈত্যবৎ বিজেপি যখন ক্ষমতার আনন্দে মত্ত তখন তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা হয় আত্মরক্ষার জন্য নত হয়ে থাকে অথবা নিজেরাই ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রবল টানের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছে এই কিছুদিন আগেই, যখন একটি বিজেপি-নিয়ন্ত্রিত পৌরসভা দিল্লীর জাহাঙ্গীরপুরি এলাকার মূলত মুসলিমদের সম্পত্তি বুলডোজার দিয়ে ধ্বংস করে। এই ঘটনা চলাকালীন কংগ্রেস সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল এবং আম আদমি পার্টি এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের "বাংলাদেশী" আর "রোহিঙ্গা" বলে চিহ্নিত করে যা আসলে অবৈধ মুসলিম অভিবাসীর সাংকেতিক নাম। এই কৌশল, যাকে অনেক সময়ই নরম হিন্দুত্ব বলা হয়, তার আবেদন খুবই স্পষ্ট। ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যানে নিজস্ব প্রস্তাবনা নির্মাণ করে, এই বিরোধী দলগুলি হিন্দুবিরোধীr তকমা এড়িয়ে যেতে অথবা জনগণ যাতে তাদের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে এক না করে ফেলেন তার চেষ্টা করে চলে। আপাতদৃষ্টিতে বাস্তব যুক্তিপূর্ণ এই সমাধান অনুযায়ী, ধর্মীয় সংবেদনশীলতা অথবা, এমনকি নরম হিন্দুত্বের অনুগ্রহ প্রার্থনা করাই বিজেপির বিরোধিতা করার সব চেয়ে ভাল পন্থা। কিন্তু সত্যিই কি তাই? একটি ছিন্নপ্রায় সামাজিক বুনন এবং পঙ্গু রাজনৈতিক মতবাদের মূল্যের দিকটি বাদ দিলেও, নির্বাচনের দিক থেকে কি এই পন্থার দীর্ঘস্থায়ী সাফল্য সম্ভব? আধুনিক ভারতের ইতিহাস কিন্তু তার বিপরীতেই সাক্ষ্য দেয়।

ভারতের রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উপনিবেশবিরোধী আন্দোলনের সময় দেশপ্রেমিকরা অনেক সময়ই তাঁদের বক্তব্যে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত লবজ ব্যবহার করতেন। যে দলটি মূলধারার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল সেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এমন অনেক নেতারই রাজনৈতিক আশ্রয় ছিল যাঁরা তাঁদের জাতীয়তাবাদের ধারণার নির্মাণে হিন্দুধর্মকে ব্যবহার করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বাল গঙ্গাধর তিলক, মোহনদাস গান্ধী এবং পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডনের মত বিভিন্ন বৌদ্ধিক অবস্থানের ব্যক্তিত্ব। অনেক পণ্ডিতই স্বাধীনতা সংগ্রামে এঁদের অবদানের কথা

মাথায় রেখেই বলেছেন যে, ধর্মের নামে এই ব্যক্তিত্বরা যে আবেদন রাখতেন তা ভারতের হিন্দুধর্মাবলম্বী নিম্নবর্গের মানুষ প্রভাবিত করলেও, তাঁদের সেইসব বক্তব্য অন্যান্য গোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন ও সন্দিহান করে তুলছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের অগ্রগতিকেও আরও মসৃণ করতে সাহায্য করছিল।

স্বাধীনতার ঠিক পরের দশক থেকেই ধর্মের অবস্থানকে রাজনৈতিক করে তোলার অনিচ্ছাকৃত ফলাফলের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমার নিজের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নেহেরু যুগের ধর্মনিরপেক্ষতার দম্ভ অনেক সময়ই কংগ্রেসের নানা কার্যকলাপের কারণে খর্ব হয়েছে যার ফলাফল রাষ্ট্র ও দল, দুইয়ের জন্য সর্বনাশা ছিল। ভারত সাধু সমাজের কাহিনীটি থেকেই যেমন শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালের শুরুর দিকে দিল্লীর বিড়লা মন্দিরে কংগ্রেস আর সাধুদের মধ্যে একটি বৈঠকের পর ভারত সাধু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। নেহরুর গভীর দ্বিধা থাকা স্বত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং পরিকল্পনামন্ত্রী গুলজারিলাল নন্দার মত ঈশ্বরভীরু জাতীয় ব্যক্তিত্বরা সোৎসাহে এই উদ্যোগকে অনুমোদন দেন। এই সন্ন্যাসীরা দেশের লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ ভারতীয়ের মধ্যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বার্তা ছড়িয়ে দেবেন – কংগ্রেস এবং সাধুদের এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেই সমাজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে, পরবর্তী কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস যা আবিষ্কার করবে তা হল, হিন্দুদের উপকারে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে শুরু করলে তা শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদেরই রাজনৈতিক শত্রু, অর্থাৎ প্রথমে জন সংঘ এবং পরে বিজেপির হাতে তুরুপের তাস হয়ে উঠবে। এই সমাজের সাধুদের নিয়ন্ত্রণ করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাঁরা পার্টিকে এমন এমন এলাকায় টেনে নিয়ে যাবেন যেখানে কংগ্রেসের ধর্মনিরপেক্ষ ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে, কিন্তু তার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি আবার সেখানে অনেক বেশি সাফল্য লাভ করবে।

উদাহরণ হিসেবে আমরা ভারত সাধু সমাজের প্রথম অধ্যক্ষ টুকডোজি মহারাজের কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করতে পারি। একদা গান্ধীবাদী ও গায়ক এই ব্যক্তিত্ব পরে অতি-ডানপন্থী হিন্দুত্ববাদী দল বিশ্ব হিন্দু পরিষদের (ভিএইচপি) একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সহসভাপতিতে পরিণত হন। গুলজারিলাল নন্দার রাজনৈতিক ভাগ্যের দিকে তাকিয়ে আরও সতর্ক হওয়া যায়। এই ক্যাবিনেট মন্ত্রী, দুইবারের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেসের একজন বলিষ্ঠ সদস্য, তাঁর সিদ্ধান্তের ফল ভোগ করেছিলেন যখন যে সাধুদের তিনি পৃষ্ঠপোষণ করেছিলেন তাঁরাই সংসদ ভবন আক্রমণে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের সাত নভেম্বর এই সাধুদের নেতৃত্বে দেশ জোড়া একটি আন্দোলনের অংশ হিসেবে গোহত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা জারির দাবি নিয়ে প্রায় এক লাখ পঁচিশ হাজার জনের একটি মিছিল লাল কেল্লা থেকে সংসদভবনে পৌঁছয়। খুব দ্রুত এই মিছিল ক্রুদ্ধ মারমুখী জনতায় পরিণত হয়। ত্রিশূল, তলোয়ার আর বর্শা হাতে, তাঁরা জোর করে সংসদ ভবনে প্রবেশ করার চেষ্টা করেন। পুলিশ তাঁদের বাধা দিলে তাঁরা কংগ্রেস সদস্যদের বাড়ি আক্রমণ করেন, শহর জুড়ে তাণ্ডব চলে এবং ভাঙচুরও হয়। এই হিংসার ফলে আটজনের মৃত্যু হয়, চল্লিশজন মারাত্মকভাবে আহত হন এবং আটশ জনকে গ্রেফতার করা হয়। দুই দিন বাদে কারফিউ উঠলে যা ঘটে তা থেকে ভবিষ্যতে কি হতে চলেছে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জন সংঘের অটল বিহারী বাজপেয়ী রাজ্যসভায় আক্রমণকারী জনতার একজন নেতার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। গুলজারিলাল নন্দা, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। তিনি তো অনেক দিন ধরেই এই সাধুদের এবং গোরক্ষক হিসেবে তাঁদের কার্যকলাপকে সমর্থন করে এসেছেন। কার্যত এই ঘটনার ফলেই একটি উজ্জ্বল রাজনৈতিক কর্মজীবনের ইতি হয়।

তা সত্ত্বেও, ইন্দিরা গান্ধী এবং কংগ্রেস ভারত সাধু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা করে চলেন। আজ যেমন কংগ্রেস আর আপ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে, তাঁরাও তেমনই হিন্দু অনুভূতি নিয়ে ব্যগ্রতার আপাত অভাবের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন। এই জন্যই তাঁরা সাধু সমাজের অনুগ্রহ চাইতেন ও হিন্দুদের সমর্থনের জন্য

উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। কিন্তু, বরাবরের মত এবারও নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করা এই দলটি আগুন নিয়ে খেলছিল এমন একটি মাঠে যা আসলে সরাসরি সংখ্যাগুরুকেন্দ্রিক রাজনীতির জন্যই অনেক বেশি উপযুক্ত ছিল। রাজীব গান্ধী সরকার যে বছর দুর্ভাগ্যক্রমে বাবরি মসজিদের তালা খোলার অনুমোদন দেয়, তার তিন বছর পরে ১৯৮৯ সালের কুম্ভ মেলায় ভারত সাধু সমাজ বিজেপি-সমর্থিত রাম জন্মভূমি আন্দোলনে অংশ নেওয়া শুরু করে। দ্রুত, অযোধ্যার একটি রাম মন্দির বানানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের স্থানটিকে "পুনরুদ্ধারের" জন্য সাধু সমাজের বারংবার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে এই সমাজ আর ভিএইচপির কার্যসূচীর মধ্যে কার্যত সমস্ত পার্থক্য মুছে যায়।

ভারত সাধু সমাজ কংগ্রেসের সৃষ্টি। কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতটাই প্রকট ছিল যে ঠাট্টাচ্ছলে তাঁদের "কংগ্রেস সাধু" বলেও ডাকা শুরু হয়। ১৯৬৬ সালে বিধানসভা আক্রমণের ধাক্কা সত্ত্বেও, কংগ্রেস এমন একটি সংগঠনকে প্রশ্রয় দিয়ে চলে যা গোরক্ষা ও গোমাংস ভক্ষণের উপর নিষেধাজ্ঞার মত আবেগপূর্ণ ও বিভেদ সৃষ্টিকারী নীতির প্রতি দায়বদ্ধ। হিন্দু ভোট আকর্ষণের জন্য কংগ্রেস রাজনীতিবিদরা প্রতিটি কুম্ভ মেলায় এই সমাজের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠে স্তুতিগান গেয়ে চলেন। ১৯৮৯ সালে এই সাধু সমাজ, যা কিনা কার্যত কংগ্রেসের সন্তান, প্রত্যাশিতভাবেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং অভিভাবকের বিরুদ্ধে গিয়ে অনানুষ্ঠনিকভাবে ভিএইচপি ও বিজেপির সঙ্গে মিলিত হয়। ১৯৯০-এর দশক শেষ হওয়ার আগেই, মাত্র দেড় দশকের মধ্যে বিধানসভায় বিজেপির আসনসংখ্যা, মূলত রাম জন্মভূমি আন্দোলনের সাফল্যের উপর ভর করে, একক অঙ্ক থেকে এক লাফে বেড়ে তিন অঙ্কে গিয়ে পৌঁছেছে।

সাম্প্রতিক ভারতে – এক হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতে – এমনকি যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতির বিরোধী, তাঁরাও মাঝে মাঝেই বলেন যে, ধর্ম এমন একটি অতীব শক্তিশালী একটি অস্ত্র যাকে শুধুমাত্র সংঘ পরিবারের হাতে ছেড়ে রাখা উচিত নয়। তাঁদের যুক্তি, হিন্দুত্বের ধাক্কা সামলানর জন্য হিন্দুধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করাই সামনে এগোনর একমাত্র বাস্তব পন্থা। এই হিন্দুধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার অর্থ হল, হয় মুসলিম ধর্মীয় প্রবণতার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মের প্রতি গভীর বিশ্বাস জাহির করা অথবা বেছে বেছে হিন্দুত্বের আগ্রাসনকেই ধিক্কার না জানানর অবস্থান নেওয়া। এই ধারণাটি তত্ত্বগত "কারণ ও ফলাফল" শৃঙ্খলের অবমূল্যায়নই শুধু করে না, তার পাশাপাশি ইদানীং এই জাতীয় কৌশলের কি ফল পাওয়া যাচ্ছে তার অত্যন্ত বাস্তব নজিরেরও যথাযথ মূল্যায়ন হয় না। এমনকি, অবিমিশ্র হিন্দুত্বের হিংস্রতার তুলনায় এই রকম অবস্থানকে অনেক বেশি নম্র মনে হলেও, তা আসলে এই অবস্থানে বিশ্বাসীদেরই পায়ের তলার মাটিতে ক্ষয় ধরিয়ে দিতে পারে। এছাড়াও, এই জাতীয় কৌশলের আদত যে মূল্য – লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলিমের ভয় এবং নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে প্রাত্যহিক বেঁচে থাকা – তার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণটি অবদান খুব বেশি না হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।

নিখিল মেনন *প্ল্যানিং ডেমোক্রেসিঃ মডার্ন ইন্ডিয়া'জ কোয়েস্ট ফর ডেভেলপমেন্ট* (কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০২২) বইটির লেখক। তিনি নত্র দাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক।